বন্ধু-গুণমুগ্ধের চোখে

নিঃশব্দে চলে গেলেন রণেন রায়চৌধুরী

খালেদ চৌধুরী

[শ্রীরণেন রায়চৌধুরী ছিলেন সেই ধরনের লোকশিল্পী যাঁর ব্রত ছিল শহুরে ছোঁয়াচ থেকে লোকসঙ্গীতকে বাঁচিয়ে রাখা, যিনি একাধিক চলচ্চিত্রে গায়ক হিসেবে থেকেও যাঁর সাধনা ছিল সঙ্গীতকে পণ্যে পরিণত না করা এবং যিনি খ্যাতির মুকুট মাথায় পরার অধিকার পেয়েও যাঁর প্রয়াস ছিল খ্যাতি থেকে দূরে থাকা, তিনি যে সবার অলক্ষ্যে ২৬ শে জুলাই, ১৯৮৫ তারিখে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। শ্রীরায়চৌধুরীর স্মরণে ১০ই আগষ্ট "মহুয়া" বেলঘরিয়া, ২৪ পরগনা একটি সভার আয়োজন করে। সেই সভায় প্রখ্যাত শিল্পী এবং লোকসঙ্গীত গবেষক খালেদ চৌধুরী মহাশয় যে স্মৃতিচারণ করেন সেটি অনুলেখন করেছেন **প্রণব ভট্টাচার্য্য**।]

অনুজের স্মরণ-সভায় অগ্রজের কিই বা বলার থাকতে পারে! আমারও কিছুই বলার নেই। রণেনকে আমি চিনতাম না। রণেনের দাদা রাধিকাবল্লভ রায়চৌধুরী ছিলেন আমার বন্ধু। রাধিকাবল্লভ অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলেন এবং ভাল ছবি আঁকতেন। দুজনে একসঙ্গে কত সময় কাটিয়েছি। কত দিন ওনাদের বাড়ীতে গেছি, কিন্তু রণেনকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

এরপর কলকাতায় এসেছি। কিছু কিছু কাজকর্ম করেছি। রাধিকাবল্লভের কোনো খবর পাই না। পরে জেনেছি তিনি সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছেন।

একদিন, সালটা ঠিক মনে নেই, সম্ভবত পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি, সকালে একটি ছেলে আমার বাসায় এসে হাজির। তার নাম বলল, রণেন্দ্রবল্লভ রায়চৌধুরী। রণেন তখন রণেন্দ্রবল্লভ রায়চৌধুরী নামই ব্যবহার করত। যাইহোক, আমি জানতে চাইলাম, 'কি ব্যাপার!' তো রণেন বলল, 'আমি আলোক-সম্পাত শিখতে চাই। আপনার সঙ্গে তাপস সেনের আলাপ আছে, আপনি আমাকে তাপস সেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন।'

সেদিন কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ রণেন বলল, 'আপনি আমাকে "আপনি আপনি" বলবেন না। আপনি আমার থেকে বয়সে বড়। তাছাড়া আপনি আমার দাদার বন্ধু হন।' আমি বললাম, 'তার মানে! তুমি আমাকে চেন নাকি?' রণেন বলল, 'হ্যাঁ, আপনাকে আমি চিনি। আপনি আমাদের বাসায় যেতেন। আমার দাদার নাম রাধিকাবল্লভ রায়চৌধুরী।'

এরপর ছেলেটিকে তাপস সেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর আর কোনো খোঁজ খবর নেওয়া হয়ে ওঠেনি। মাঝখানে একবার তাপস সেনের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, 'আচ্ছা আপনার কাছে যে ছেলেটিকে নিয়ে এসেছিলাম তার কি হল?' তো তাপস সেন বললেন, 'ছেলেটির গুণ আছে তবে সে "আলোর" জগতের লোক নয়। তার উপযুক্ত

জায়গায় তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

ব্যাপারটা ভুলেই গেছিলাম। অনেকদিন বাদে, একদিন তাপস সেন বললেন, 'আজ মিনার্ভায় একটা অনুষ্ঠান আছে। ঋত্বিক ঘটক যেতে বলেছেন।' সেদিন তাড়াতাড়ি হাতের কাজ শেষ করে মিনার্ভায় গেলাম। সেখানে পূর্ব বাংলার নানান অঞ্চলের লোকসঙ্গীত শিল্পীরা এসেছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসঙ্গীত গেয়ে শোনালেন—কখনও একক, কখনও দ্বৈত, আবার কখনও বা সমবেতভাবে। কম বেশী সব গানই ভাল লাগল। কিন্তু একটা গান যেন সকলকে ছাড়িয়ে গেল। গানটি একটি ছেলে গাইছে —যেমন তার গলা, তেমনি তার সুর। দেখলাম শুধু আমি নয় প্রতিটি শ্রোতা যেন মুগ্ধ। অনুষ্ঠান শেষ হবার পরও যেন ভুলতে পারছিলাম না সেই ছেলেটির কথা। আড়ালে তাপস সেনকে ডেকে বললাম, 'আচ্ছা ওই ছেলেটি কে বলুন তো, যেন কোথায় দেখেছি।' তাপস সেন বললেন, 'আরে এই-ই তো সেই রণেন যাকে আপনি আমার হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আমি দুদিনেই বুঝতে পারি যে ও গানের জগতের লোক। তারপর এই তো আজ দেখলেন।'

রণেন একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল এবং একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীও ছিল। [শ্রীরায়চৌধুরী ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হন। —প্র ভ.] 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ'-এর সঙ্গে রণেনের যোগাযোগ ছিল। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের হয়ে রণেন বহু জায়গায় অনুষ্ঠান করেছে। সেই সময় ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের যারা সদস্য ছিল তারা প্রায় সবাই পরবর্তীকালে গানের রেকর্ড বের করে এবং শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠাও পায়। এটা ভাল না মন্দ সে প্রসঙ্গে যাব না। তবে রণেন কিন্তু তার শিল্পীসত্তাকে বিক্রী করতে চাইত না। এমনকি কোনো অনুষ্ঠানেও সে সহজে যেতে চাইত না।

ঋত্বিক ঘটক রণেনকে খুব ভালবাসতেন। দেশ ভাগ হবার জন্যে যারা দেশ ত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল তাদের বুকের মধ্যে একটা হাহাকার থেকে গিয়েছিল। ঋত্বিক ঘটকের মধ্যেও সেটা ছিল। রণেনের গাওয়া পূর্ববাংলার লোকসঙ্গীতের আদি ও অকৃত্রিম সুরের মধ্যে ঋত্বিক ঘটক যেন একটা আশ্রয় খুঁজে পেতেন। সেই জন্যে ঋত্বিক ঘটকের অধিকাংশ বইতে রণেনকে নামী দামী গায়কের পাশে বারে বারে স্থান পেতে দেখি। ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' বইয়েতে রণেন নেপথ্যে গায়ক ছিল। 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা' এবং 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' বইতে রণেন ছোট খাট অভিনয় সহযোগে গান গেয়েছে।

পরবর্তীকালে আমরা যখন ভারতীয় লোকসঙ্গীতের সংগ্রহশালা Folk Music and Folklore Research Institute গড়তে চেষ্টা করি, রণেন আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে সেই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে যুক্ত ছিল।

রণেনের গান সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলা দরকার—রণেন গাইত মারিফতি। হিন্দুদের যেমন বাউলগান, মুসলমানদের তেমনি মারিফতি। উভয় সঙ্গীতই কোনো না কোনো বিশেষ অঞ্চলের লোকদের গাইতে দেখা যায়। খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে পারস্য দেশে শরিয়তের (আল্লাই সব) বিরোধিতার মধ্যে থেকে মারিফত (নিজেকে জানার মধ্যে দিয়ে আল্লায় উপনীত হওয়া) ধারার সৃষ্টি। নিজেকে জানবার জন্যে কতকগুলো প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। প্রথমেই প্রয়োজন হয় একজন সঠিক গুরু নির্বাচনের। এরপর দেহতত্ত্ব বা দেহের উপাদান,

দেহের অস্থিসংস্থান, প্রকোষ্ঠ ও যন্ত্রগুলোর কাজ সমন্ধে সমাক জ্ঞান। এরপর আসে মনকে সংযত করার জন্যে মনঃশিক্ষা। এইভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে শেষ পর্যায়ে আল্লায় বিলীন হবার আকাঙ্খার মধ্যে মারিফত ধারায় সার্থকতা অর্জন করার কথা ভাবা হত। মারিফতের প্রতিটি পর্যায়কে সঙ্গীতে প্রকাশ করা হয় এবং সব পর্যায়কে এক সঙ্গে মারফতি বলে। ঠিক একই রকম আর একটা মতবাদ সুফীবাদ। সাফ্ বা পরিষ্কার করা কথা থেকে সুফীবাদের জন্ম। একাদশ শতাব্দীতে ভারতে মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মারিফতিকে মুসলমান ফকিররা ভারতে আনে। বাংলার বাউলগান সপ্তদশ শতাব্দীর আগে সম্ভবত সৃষ্টি হয়নি। বাউলগানে মারিফতির প্রভাব তাই খুবই স্পষ্ট। উভয় সঙ্গীতই ধর্মীয় বিধি নিষেধ, রীতি প্রকরণের বাইরে থেকে সংসার ত্যাগ করে বাউল বা ফকিররা গেয়ে বেড়াত।

বাংলাদেশের শিলেট এবং অন্যান্য কয়েকটি জেলার মুসলমান ফকিররা এই মারিফতি গান গেয়ে বেড়ায়। কিন্তু আজকাল মারিফতি গানেও নগর সভ্যতার ছোঁওয়া পড়ে তার বিশেষত্বকে নষ্ট করে দিচ্ছে। রণেন মারিফতির সেই প্রাচীন ধারাকে অবিকৃতভাবে ধরে রেখেছিল।

রণেনদের বাড়ী ছিল শিলেটে। শিলেট শহরে প্রতি বছরে একটা মেলা হত। মেলাটার নাম ছিল শাহ্ জালালের মেলা। প্রতি বছর মেলার সময় দূর দূর দেশ থেকে দরবেশ ফকিররা সব এখানে আসতেন এবং কিছুদিন থাকতেন। তাঁরা সারা বছর ধরে যে সব গান বাঁধতেন সে সবই তাঁরা সেখানে গেয়ে শোনাতেন। রণেন তাঁদের কাছেই মারিফতি গান শেখে। ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল না। দু-চারটে গান হয়ত কেউ শোনাতে পারে। কিন্তু মারফতির নিজস্ব একটা ঘরানা আছে, আর নিজের গোষ্ঠীর বাইরের লোককে কেউ নিজের ঘরানা শেখায় না। এর জন্যে রণেনকে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে, বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। এই সব ফকিরদের সঙ্গে রণেনকে সম্পূর্ণভাবে মিশে যেতে হয়েছিল। বাড়ী থেকে পালিয়ে রণেনকে দিনের পর দিন ফকিরদের সঙ্গে থাকতে হয়েছিল। তাঁদের জীবনযাত্রা সংসারী লোকের মত স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু রণেন সেই জীবনে নিজেকে মানিয়ে নেয়। তাছাড়া রণেনকে তাঁদের টুকটাক কাজও করে দিতে হত। যেসব ফকিররা গাঁজা খেতেন তাঁদের ছিলিম সেজে দিতে হত। এমনকি তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করার জন্যে রণেনকে গাঁজাও খেতে হয়েছিল। আর এইভাবে শ্রম ও নিষ্ঠা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে রণেন লোকসঙ্গীতের অন্তর্লীন রূপকে বিকৃত না করে তুলে আনতে পেরেছিল। সত্যিই এটা ছিল সাধনার ব্যাপার।

রণেনের গানের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল গানের মধ্যে ধ্বনিগত-'হ'-এর নিখুঁত ব্যবহার। ব্যাপারটা আর একটু গুছিয়ে বলি। আপনারা হয়ত অনেককেই জানেন যে সব দেশের—অর্থাৎ পৃথিবীর সব দেশের—লোকসঙ্গীতের মধ্যে শব্দের সঙ্গে একটা বাড়তি 'হ'-এর যোগ দেখা যায়। যেমন, 'ও কোকিলা—' কথাটা যখন লোকসঙ্গীতে গাওয়া হয় তখন 'ও কোহকিলা—' হয়ে যায়। এমনকি পল রোবসনের গানেও এটা আছে। যেমন "I' m tired of living" গানটা গাওয়া হয় 'আহাম্ টায়ার্ড অভ্ লিভিং।' এর একটা কারণও আছে—সব দেশেই লোকসঙ্গীত গড়ে ওঠে শ্রমজীবী মানুষদের মুখে মুখে। শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের কাজ করতে করতে এই সব গান গায়। গানের তালে তালে কাজের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাসের যে

ধাক্কাটা বেরিয়ে আসে তাতেই একটা বাড়তি-'হ' শব্দের সঙ্গে এসে যায়।

আগেই বলেছি, রণেনদের বাড়ী ছিল বাংলাদেশের শিলেটে— শিলেট জেলার সুনামগঞ্জ থানার সুরমা নদীর ধারে ছাতক গ্রামে। যাঁরা সুনামগঞ্জ গেছেন তাঁরা জানেন যে এখানকার বৈশিষ্ট্য হল যে গ্রামগুলো হয় উঁচু জায়গায় এবং পাঁচ সাত মাইল দূরে দূরে। মাঝে ঢালু এবং নিচু জমি মাইলের পর মাইল জুড়ে থাকত। এগুলোকে স্থানীয় ভাষায় 'হাওড়' বলে। গ্রীষ্মকালে 'হাওড়' ধূ-ধূ করত, আর বর্ষাকালে জলে ডুবে যেত। একটা গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে হলে নৌকায় করে যেতে হত। নৌকার মাঝিদের দেখবেন তারা তালে তালে বৈঠা ফেলে আর তারা এই তালটা রাখে দেহের একটা ঝাঁকির মধ্যে। রণেন যখন গান গাইত তখন সামনে পেছনে দুলে দুলে—মাঝিদের মত এক একটা ঝাঁকি দিয়ে—তালে তালে গাইত। এর ফলে তালের যে ঝোঁকটা হারিয়ে যেত তাকে শরীরের ঝাঁকির সঙ্গে একটা বাড়তি 'হ' দিয়ে ধরত, অর্থাৎ প্রয়োজনের তাগিদেই বাড়তি-'হ' শব্দের সঙ্গে এসে যেত, কৃত্রিমভাবে তাকে গানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিত না।

নৌকার মাঝিরা যেমন সামনে পিছনে দুলে দুলে গান করে তেমনি ফকিররাও মারিফতি গাইবার সময়ও দুলে দুলে গান করেন। ফকিররা যখন সন্ধ্যেবেলায় মারিফতি ধরেন তখন বেশীর ভাগ সময়ই তাঁরা নেশাগ্রস্ত থাকেন। গানের শেষে তাঁরা গানের একটা অংশ বারে বারে গাইতে থাকেন। গানের গতিও বাড়ে দুলুনিও বাড়তে থাকে। এই অবস্থাকে 'জীক্‌র্' বলে। শেষ পর্যন্ত গায়ক ফকির অজ্ঞান হয়ে যান। এই সব কিছুর প্রভাব রণেনের গানে দেখা যায়। লোকসঙ্গীতের এই যে বিশেষ আঞ্চলিক রীতি, আমরা যারা লোকসঙ্গীত সংগ্রহ এবং তার সাহায্যে সমাজের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করি—যেমন, কারা এই সব গান গাইত, তাদের জীবিকা কি ছিল প্রভৃতি, তাদের কাছে—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়ে থাকে।

রণেন মারফতি ছাড়াও বিশেষ শিলেটি, ভাটিয়ালি এবং মেয়েলী গান, যেমন গোষ্ঠগান গাইত। রণেনের কাছে বাংলার প্রচলিত লোকসঙ্গীতের এক বিপুল সংগ্রহ ছিল এবং সে সমস্তই লোকসঙ্গীত সংগ্রহশালায় দান করে তাকে সমৃদ্ধিশালী করেছে।

সব শেষে এটা বলা দরকার যে রণেন লোকসঙ্গীতে কোনো রকম বিকৃতি বা কৃত্রিমতা সহ্য করতে পারত না। পেশাদারী গায়ক হতে হলে জনগণের মনোরঞ্জনের ব্যাপারটা অস্বীকার করার উপায় নেই—এটা রণেন ভালই বুঝত। আর সেই কারণেই সে তার শিল্পীসত্তাকে বাজারের পণ্যে পরিণত করতে চায়নি। আজকাল অনেক শিল্পীকেই দেখি শহরের কবিদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে 'প্রচলিত' বলে চালিয়ে দিচ্ছেন, গানের মধ্যে যেখানে সেখানে একটা 'হ' জুড়ে দিচ্ছেন অথবা অনুষ্ঠান করতে ওঠার সময় প্যান্টশার্ট বা ধুতি পাঞ্জাবী ছেড়ে আলখাল্লা পরে বাউল সাজছেন। রণেন এসব ভণ্ডামী সহ্য করতে পারত না। মনে মনে কষ্ট পেত। আর তাই একটা সন্তরণশীল ও উদাত্ত কণ্ঠর অধিকারী হয়েও রণেন সকলের অগোচরেই রয়ে গেছিল।

জীবনের প্রায় অর্দ্ধেকটা সময় শহর ও শহরাঞ্চলে কাটালেও রণেনের মন থেকে গ্রাম মুছে যায়নি কোনোদিন। ভরা দুপুরে চায়ের দোকানে বসে অথবা রাতের কলকাতায় পথ চলতে চলতে যখন হঠাৎ সে গান ধরত, তখনও জলে ডুবে থাকা হাওড়ের ওপর কম্পমান

সুরের প্রতিচ্ছবিকে ফুটে উঠতে দেখেছি।

বাঙালী বড় বিস্মৃতি-প্রবণ জাতি, অতীতকে সে বারে বারেই ভুলে যায়। তাই আজ যখন আপনারা রণেনের স্মৃতি রক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এখানে এসেছেন তখন আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ এই আবেগ থাকতে থাকতেই আপনারা কিছু করুন, নাহলে হয়ত রণেনের জীবন যেমন সকলের অগোচরেই ছিল, চলেও গেল যেমন সবার অলক্ষ্যে—হয়ত তেমনি তার শিল্প-সাধনা সকলের অজ্ঞাতই থেকে যাবে।

[সবুজ সাক্ষর, ১৯৮৬]

কালির বন্ধু রণেন

রোজান দাশগুপ্ত

আমি ভারতে এসে কালি দাশগুপ্তকে বিয়ে করি ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে। কালি তার আগের দশ বছর সারা ব্রিটেন ঘুরে ফোক ক্লাবগুলোতে লোকশিল্পীদের গান শুনে কাটিয়েছিল। সেসব শিল্পীরা বেশির ভাগই খালি গলায় নিজেরা গান গাইত, নয়তো অন্য শিল্পীদের সামনে ঘরোয়া অন্তরঙ্গ আসরে গান গাইত। কালির ইচ্ছে ছিল কলকাতায় ঐরকম ফোক ক্লাব গড়ে তুলবে। আর এ কাজে তার প্রাণের বন্ধু রণেনের চেয়ে ভালো সঙ্গী আর কে-ই বা হতে পারে। রণেনের সঙ্গে তার রাজনীতির মিল ছিল। আর যেকোনো সময় যেকোনো জায়গায় তার গলা থেকে গান স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বেরিয়ে আসত। তার কোনো সঙ্গতিয়ার দরকার হত না। আমার যত দূর মনে পড়ে, রণেন তখন গান গাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। কালিই তাকে সর্বশক্তি দিয়ে চাপ দিয়ে রাজি করায়। ফোক ক্লাব অবশ্য শেষ অব্দি গড়ে ওঠেনি, তবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লোকসরস্বতী, রণেন যার প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। তারপর এরা দু'জন অনেক বার একই মঞ্চে গান গেয়েছে।

কালি বরাবরই রণেনের কাছে তার তার ঋণ স্বীকার করত। কারণ রণেনের কাছ থেকেই তো সে বেশির ভাগ ভাটিয়ালী, সিলেটি আর মারিফতি গান শিখেছিল। এইসব সম্পদ তার পেশ-করা গানের সম্ভারটিকে বিপুলভাবে ভরিয়ে তুলেছিল। কালি অবশ্য সবসময়েই বলত যে এসব গান রণেন যেভাবে গায়, তার কাছে তার নিজের গাওয়া কিছুই নয়।

বড়ো মাপের সঙ্গীতজ্ঞদের দুভাগে ভাগ করা যায়। একদল আছেন যাঁরা সমঝদার শ্রোতা পেলে তবেই ভেতর থেকে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতটা উজাড় করে দিতে পারেন। অন্য দল নিছক গাওয়ার কিংবা বাজানোর আনন্দেই মশগুল হয়ে থাকেন। এই ধরনের সঙ্গীতজ্ঞের সংখ্যা খুব কম। নিজেদের সঙ্গীতের ভুবনে হারিয়ে গিয়ে এঁরা শ্রোতাদের অস্তিত্বই যেন ভুলে যান, অথচ সংগীতের প্রতি তাঁদের প্রেমের এই তীব্রতাই শ্রোতাদের অজান্তে তাঁদের কাছে টেনে আনে। কলকাতায় এসে প্রথম কয়েক বছরে আমি যেসব শিল্পীর গানবাজনা শুনেছি, তার মধ্যে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় আর রণেন এই দ্বিতীয় দলে পড়েন।